পরীক্ষার পর পরীক্ষা, কিন্তু কোথায় মূল্যায়ন ও মূল্যবোধের ভিত্তি?

কবির উদ্দিন

: রোববার, ২৭ জুলাই ২০২৫

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যেন এক অন্তহীন পরীক্ষার চক্রে আবদ্ধ। পরীক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিক মূল্যায়নের সূচনা ঘটে। অথচ দেখা যায়, এই সনদ বহু উচ্চ বিদ্যালয়েই স্বীকৃতি পায় না। ফলে শিক্ষার্থীদের আবারও ভর্তি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে প্রায় তিন ঘণ্টার দীর্ঘ প্রশ্নপত্রে উত্তীর্ণ হয়েও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে মাত্র এক-দুই ঘণ্টার একটি একক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বিস্ময়ের বিষয় হলো, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই এক-দুই ঘণ্টার পরীক্ষাতেই শিক্ষার্থীর জ্ঞান, মেধা ও প্রস্তুতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করতে সক্ষম বলে ধরে নেয়! এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে চার-পাঁচ বছর কঠোর পরিশ্রম করে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেও একজন শিক্ষার্থীকে চাকরির জন্য আবারও প্রমাণ দিতে হয়, এইবার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায়। সেখানে বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার চেয়ে মুখস্থ করা সাধারণ জ্ঞান কিংবা “গরুর রচনা” লেখার দক্ষতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বহু বছর ধরে পরীক্ষা দিয়ে কেউ কেউ শেষ

পর্যন্ত সরকারি চাকরির ‘চেরাগ’ পায়। এখানে প্রশ্ন জাগে, এই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে অর্জিত সার্টিফিকেটগুলোর প্রকৃত মূল্য কোথায়? ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স করেও যদি বিদেশে পড়তে যাওয়ার আগে আইইএলটিএস দিয়ে ভাষাজ্ঞান প্রমাণ করতে হয়, তবে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মান কি একে অপরের মধ্যে বা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়? এই সংকটের দায়ভার কাদের ওপর বর্তায়?

শুধু পরীক্ষাই নয়, বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সেতুবন্ধনও দুর্বল। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে “নদীর রচনা” বা “গরুর জীবন” মুখস্থ করানো হয় গ্রামীণ ছাত্রদের, যাদের প্রতিদিনের বাস্তব জীবনে গরুই নিত্যসঙ্গী। তারা গরুর রচনা লিখবে সাবলীলভাবে, মুখস্থ না করে। অথচ, জীবনের লক্ষ্য মুখস্থ করেও শিক্ষার্থীরা জানে না কিভাবে নিরাপদে রাস্তা পার হতে হয়, কেন জেব্রা ক্রসিং আছে, কিভাবে ট্রাফিক আইন মেনে চলতে হয়। আমরা পড়ি, পাস করি, সার্টিফিকেট অর্জন করি, অথচ আমাদের আচরণ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে শিক্ষার প্রতিফলন দেখা যায় না। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নেই, শ্রেণীকক্ষ তালাবদ্ধ রাখতে হয় চুরির ভয়ে, শিক্ষককে অপমান করা কিংবা অপসারণে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, এসব যেন অপ্রিয় বাস্তবতা। শিক্ষিত মানুষের দামি গাড়ির চালক অহেতুক হর্ন বাজিয়ে নিজেকে ভিআইপি ভাবেন, এসব কি শিক্ষার ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত নয়? এই অগণিত পরীক্ষার পরও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে পিছিয়ে আছে। অথচ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ অতিক্রম করেছে এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান শিগগিরই ১০০ বছরে পৌঁছাবে। তাহলে বোঝাই যায়, শুধু পরীক্ষার বহর দিয়ে নয়, সঠিক মূল্যায়ন ও বাস্তবজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার অভাবেই আমরা পিছিয়ে পড়ছি। প্রশ্ন জাগেÑ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কেন বিশ্ববাজারের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম ঈঊঙ তৈরি করতে পারছে না?

সার্টিফিকেট তখনই মূল্যবান হবে, যখন তা ব্যক্তির জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের উৎকর্ষতা প্রকাশ করবে। “কে কত নম্বর পেল” সেটি মুখ্য নয়, বরং “কে কতটা জানে, বোঝে ও সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারে”Ñএই প্রশ্নে ভিত্তি করে হওয়া উচিত প্রকৃত মূল্যায়ন। তবে এর মানে এই নয় যে

কেউ পরীক্ষা না দিয়েই অটো-সার্টিফিকেট পাবে। পাঠ্যপুস্তকের সীমা ছাড়িয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাগরিক দায়িত্ব, পরিবেশ সচেতনতা, নৈতিকতা ও শিষ্টাচারের চর্চা গড়ে তুলতে না পারলে, পরীক্ষার ফলাফল কখনোই একজন ভালো মানুষ তৈরিতে সহায়ক হবে না। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, একজন সচেতন, নৈতিক ও সমাজ-দায়িত্ববান মানুষ তৈরি করা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে মুখস্থনির্ভরতা ও সার্টিফিকেটনির্ভর মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এনে মানবিক মূল্যবোধ ও বাস্তবজ্ঞানভিত্তিক রূপে পুনর্গঠন করতে হবে। সেই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোডাক্ট যেন আন্তর্জাতিক বাজারে নেতৃত্ব দিতে পারে। পরীক্ষার সংখ্যা কমিয়ে, বাস্তবজীবনে প্রযোজ্য শিক্ষা এবং স্বচ্ছ, গ্রহণযোগ্য ও দক্ষতাভিত্তিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারলে, সার্টিফিকেটের পাহাড়েও দাঁড়িয়ে জাতি এগিয়ে যেতে পারবে না।

[লেখক : ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, ইসিমোড, নেপাল]